বিখ্যাত সিরাত সিরিজ

মুহাম্মাদ (সা.)

১ম খণ্ড

ড. ইয়াসির ক্বাদি

অনুবাদ

মাসুদ শরীফ

ফরহাদ খান নাঈম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য

যিনি জানেন অন্তরের লুক্কায়িত কথা;

যা জিহ্বা প্রকাশ করে না।

বিশ্বাসীরা তাঁর সামনে মাথা নত করে,

আর বিচার দিবসে তাঁর কাছেই সবাই আর্জি জানাবে।

সালাম ও সালাত বর্ষিত হোক সেই মহান ব্যক্তির প্রতি,

যার ওপর কুরআন নাজিল হয়েছে।

যার বার্তা ও শিক্ষা হৃদয়-আত্মার শান্তির উৎস।

আমি ১৯৯৫ সালের আগস্টে আমি মদিনার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করি। তখন আরবি প্রোগ্রামের প্রথম সেমিস্টারে একজন শিক্ষকের সান্নিধ্য পাই। তবে এই মুহূর্তে তার নাম মনে করতে পারছি না। কিন্তু এটা সত্য, তার মুখাবয়ব ও আচরণ চিরদিনের জন্য আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে। প্রথমে তিনি আমাকে সিরাতের মৌলিক কাঠামো শিখিয়েছিলেন। যদিও এই স্তরে আরবি ইনস্টিটিউট (আমরা একে ডাকতাম শুবাহ)-এর লক্ষ্য ছিল ভাষা শিক্ষা; অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা নয়। তবে সেই মহান শিক্ষক একটি বিশেষ বিষয় আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন। এটা কোনো দিন

ভুলতে পারব না। তিনি বলেছিলেন–'আমি জন্মেছি এবং বড়ো হয়েছি এতিম হিসেবে। শুধু আল্লাহ তায়ালাই জানেন আমার জীবন কতটা কঠিন ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) এতিম ছিলেন, এটা শুনে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমি সব সময় অনেক সান্ত্বনা ও সাহস পেতাম।'

তার এসব মূল্যবান কথা শুনেছি আমি মাত্র ২০ বছর বয়সে। সত্যি বলতে, এর আগপর্যন্ত আমি রাসূল (সা.)-এর সাথে একাত্ম হতে পারিনি। অবশ্যই তাঁর প্রতি আমার অসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু আমি তাঁকে কেবল অত্যন্ত সম্মানিত একজন পূর্বপুরুষই মনে করতাম। অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে কেবল বিভিন্ন কিংবদন্তিই শুনেছি, কিন্তু কখনো দেখিনি। কিন্তু সেই শিক্ষকের বয়ান আমার ধারণা পালটে দিয়েছে। তাঁর থেকেই নবিজির সাথে সরাসরি সংযোগ অনুভব করতে শিখলাম। এই অনুপ্রেরণা আমাকে সিরাতের পথে চালিত করেছে। এখনও সিরাতুন্নবি নিয়ে মজে আছি।

পরবর্তী সময়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদিস অধ্যয়ন অনুষদে প্রবেশ করি। আর তখন সিরাহ বিষয়ে আরও উচ্চতর ক্লাসে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়। ফলে পেয়ে যাই বিদ্বান ও পণ্ডিত সব অধ্যাপকের আন্তরিক সহবত। তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন ইরাকের বিখ্যাত সিরাহ বিশেষজ্ঞ ড. আকরাম দিয়াউ আল উমারির অধীনে প্রশিক্ষিত ও গবেষণা সম্পন্নকৃত। দুঃখের কথা হলো, আমি মদিনায় পৌঁছে তাঁকে শিক্ষক হিসেবে পাইনি।

তবে কিছু সম্মেলনে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য হয়েছিল।

সেই বছর আল্লাহ এমন একজনের সাথে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন, যিনি আমার জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। তিনিই শাইখ শফিউর রহমান আল মুবারকপুরী (মৃত্যু : ২০০৬)। *আর-রাহিকুল মাখতুম (The Sealed Nectar)* নামক প্রখ্যাত গ্রন্থটি তাঁরই রচনা। গ্রন্থটি ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে *মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ* কর্তৃক আয়োজিত একটি বিশ্ব প্রতিযোগিতায় সেরা আধুনিক সিরাহগ্রন্থ হিসেবে শীর্ষ পুরস্কার অর্জন করে।

শাইখ ছিলেন মদিনায় বসবাসকারী শান্ত ও বিনয়ী একটি মানুষ। তার খুব বেশি ছাত্র ছিল না। যেভাবেই হোক, আল্লাহর ইশারায় তিনি আমাকে প্রতিদিন নবির মসজিদে ব্যক্তিগতভাবে শেখাতে সম্মত হন। আমাকে সহিহ বুখারি পড়াতে শুরু করেন। তিনি ছিলেন আমার প্রথম হাদিস শিক্ষক। আর তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যার থেকে আমি ইজাজা (শিক্ষাদানের লাইসেন্স) লাভ করি। তবে আমি যে তাকে কেবল সহিহ পাঠদানের জন্যই মনে রেখেছি, তা নয়। মূলত তিনি ছিলেন তথ্যের এক এনসাইক্লোপিডিয়া। আর তাঁর মধ্যে এক নীরব আকর্ষণ ছিল। ছিল বয়স্ক দাদুর মতো সূক্ষ্ম রসবোধ। তার বিশেষ হাসি এবং চোখের ঝিলিক দেখে যে কেউ বুঝতে পারত, তিনি রসিকতা করতে যাচ্ছেন! প্রায়ই ইমাম বুখারির সহিহ নিয়ে আমাদের আলোচনা সিরাহর বিভিন্ন দিকে মোড় নিত।

এগুলো ছিল আমার জীবনের কিছু জাদুকরি মুহূর্ত, যা আজও লালন করি। তখন বুঝতে পারিনি আমি কতটা সৌভাগ্যবান ছিলাম। মসজিদে নববিতে বসে সিরাহর সবচেয়ে বড়ো পণ্ডিতের (যারা জীবিত আছেন তাঁদের মধ্যে) সাথে নবির জীবনের অনন্য সব দিক নিয়ে আলোচনা করছি আর শুনছি। সিরাতের এসব ঘটনা তো একসময় আমার অবস্থান থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরেই ঘটেছিল! এই লাইনগুলো লিখতে গিয়ে সেসব আনন্দময় বছর এবং অতীত স্মৃতির ডালি স্মরণে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

এক সন্ধ্যায় তিনি সিরাতের কিছু দিক বর্ণনা করছিলেন। হঠাৎই আমি তাঁর কাছে একটি অনুরোধ করলাম। প্রস্তাব করলাম, একটি সকাল আমার সাথে কাটাতে আর সিরাহর ঘটনাগুলো মদিনা শহরের যেসব স্থানে ঘটেছিল, আমাকে সেসব স্থান সরেজমিনে দেখাতে পারেন কিনা!

অনুরোধটি অনেকটা দুঃসাহসীই ছিল বটে। কেননা, এত সম্মানিত একজন ব্যক্তির মূল্যবান সময় নেওয়ার মতো যোগ্য ব্যক্তি ছিলাম না আমি।

তবে আনন্দের বিষয় হলো, তিনি কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সহজে রাজি হলেন। বসন্তের এক সুন্দর সকালে নবির শহরে আমি তাঁকে মসজিদে নববির বাইরে থেকে গাড়িতে তুলে নিলাম। আমরা মদিনা শহরের চারপাশে ঘুরে বেড়ালাম। শহরের উপকণ্ঠে আইর ও থাওর পাহাড়, উহুদের যুদ্ধক্ষেত্র, খন্দকের যুদ্ধক্ষেত্র এবং আমাদের বইয়ে উল্লেখিত বিখ্যাত কিছু

কুয়াসহ আরও কিছু স্থান দেখলাম। কতই-না দারুণ ছিল সেই দিন, সেই সময়!

আমি প্রায়শই মদিনার দর্শনীয় স্থানগুলো পরিদর্শন করার সময় জিয়ারাহ ট্রিপ পরিচালনা করি। বিশেষত জাবালে রুমাহতে ওঠার সময় শাইখের সাথে কাটানো সেই সুন্দর দিনটি খুব মনে পড়ে। উল্লেখ্য, জাবালে রুমাহ নামক স্থানে উহুদের তিরন্দাজরা তাদের পিঠ উহুদের দিকে রেখেছিল। আক্ষরিকভাবেই আমি শাইখের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। তিনি যেখানে যেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই স্থানসমূহে যাই। তিনি আমাকে যা যা বলেছিলেন, আমার শ্রোতাদেরও তা-ই বলি।

দুঃখের বিষয় হলো, সেই সকাল ছিল তাঁর সাথে কাটানো শেষ সময়গুলোর একটি। কারণ, কিছুক্ষণ পরেই শাইখ জানালেন, তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন এবং আমাকে আর পড়াতে পারবেন না।

এরপর তিনি ভারতে নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন। ক্যান্সারের ধকল সহ্য করে অবশেষে ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্তেকাল করলেন।

শাইখ শফিউর রহমান আমাকে অনেক কিছুই শিখিয়েছেন। তিনিই আমার মধ্যে সিরাতুন্নবির প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা গেঁথে দিয়ে গেছেন। তার এই অসামান্য কাজটি আল্লাহ কবুল করুন। সর্বোপরি তাঁর ওপর রহম বর্ষণ করুন।

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পড়াশোনা পুরো দশক ধরে চলেছিল। স্নাতক স্তরে 'হাদিস ও হাদিসের বিজ্ঞান' এবং স্নাতকোত্তর স্তরে 'প্রারম্ভিক ইসলামি ধর্মতত্ত্বের বিকাশ' বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ ছিলাম। আমার প্রকৃত কোর্সগুলো ঐতিহাসিক বা সিরাহভিত্তিক ছিল না। তা সত্ত্বের আমি ছিলাম সিরাতের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। সিরাতকে নতুন করে অধ্যয়ন এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও উৎস থেকে বিশ্লেষণ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে সব সময়ই ছিল। এই বিষয়ে কোনো বই খুঁজে পেলে তৎক্ষণাৎ তা কিনে ফেলতাম। এভাবে সিরাহ সম্পর্কিত আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পড়াশোনার চাপে সেসব বইয়ের স্বাদ নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

২০০৫ সালের প্রথম দিকে আমি আমেরিকায় ফিরে আসি। তখন একটি মসজিদ কতৃপক্ষ আমার কাছে এসে জানতে চায়, আমি তাদের মসজিদে নিয়মিত সাপ্তাহিক ক্লাস শুরু করতে চাই কি না। এই মসজিদেই (সিনট মসজিদ) কিশোর বয়সে তারাবি পড়তাম। তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে বলি, আমি সিরাত সম্পর্কে ক্লাস শুরু করতে চাই। তবে আমি মাত্র ছয় মাস হিউস্টনে থাকব। কারণ, সেই বছরের শেষের দিকে কানেকটিকাটে গিয়ে আমার ডক্টরাল ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা শুরু করব। তাই মদিনা থেকে ফিরে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই আমি সিরাত পাঠের সুযোগ পাই। তারপর মনোযোগ দিই হাদিসে।

নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া না গেলে অন্তত আমি আমার রেফারেন্স গ্রন্থগুলোতে পাওয়া জীবনীসমূহের টুকরো টুকরো অংশ নিয়েও গবেষণা চালাতাম। তারপর ধাবিত হতাম সিরাতের আধুনিক গবেষণার দিকে। এই সমস্ত গবেষণার সময় নিজের ওপর কয়েকটি শর্তও আরোপ করে দিতাম। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ছিল ইবন হাজারের *আল ইসাবাহ ফি তামইজ আল সাহাবাহ*-এর অনুসরণ।

প্রথমত, কৌতূহল আমাকে যেখানে নিয়ে যেত, সেখানেই যেতাম। কখনো কখনো আমাকে ব্যাখ্যা করতে হতো, কেন একটি নির্দিষ্ট প্রথা পালন করা হচ্ছে বা কোনো বিশেষ সাহাবির উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কি না। এক্ষেত্রে আমি নিজের মনকে অবাধে বিচরণ করার সুযোগ দিতাম। যা কিছু জানা ছিল না, তা নিয়ে করতাম গবেষণা। এতে কত সময় ব্যয় হলো, তা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে অন্য কাউকে উপকৃত করার আগে প্রথমে আমি নিজেকে উপকৃত করতে চেয়েছিলাম।

দ্বিতীয়ত, ইন্টারমিডিয়েট অ্যাডভান্স বলতে যে স্তরকে মনে করি, সেই স্তরে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মূলত এটি নির্ধারণ করেছিলাম। আমার মতে, সিরাতের ক্ষেত্রে মৌলিক স্তর হলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সহজ ও সময়ানুক্রমিক বর্ণনা। এই স্তরে সাধারণত যেকোনো উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতি খুব কমই ব্যাখ্যা করা হয়। কোনো ফজিলত বা তাৎপর্য প্রায় বর্ণনা করা হয় না বললেই চলে। উদাহরণস্বরূপ *আর রাহিকুল মাখতুম*-এর

কথা বলা যায়। গ্রন্থটি প্রাথমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থীর জন্য একটি আদর্শ সিরাতগ্রন্থ। ইন্টারমিডিয়েট স্তর হলো, যেখানে প্রত্যেক ঘটনার রেফারেন্স কোথায় পাওয়া যায়, তা আলোচনা করা এবং সিরাহর প্রতিটি ঘটনা থেকেই কিছু না কিছু ফায়দা তুলে ধরা হয়।

অন্যদিকে অত্যন্ত উঁচু স্তরের কাজের জন্য প্রতিটি ঘটনার উৎস নির্ধারণ, সেই ঘটনার বর্ণনাকারীদের সনদ বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিতর্ক বা ভুল বোঝাবুঝি উল্লেখের পাশাপাশি এর সকল উপকারিতা বিস্তারিত তুলে ধরা প্রয়োজন। তবে এমন উন্নত স্তরের কাজ কোনো ভাষায়ই সম্পন্ন হয়নি। সত্য বলতে, এটি একধরনের বিরামহীন প্রকল্প। এমন কাজ নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার জন্য করা যেতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট ঘটনার ওপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ গবেষণাপত্র লেখা যেতে পারে।

অতএব মধ্যম-উন্নত বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি, আমার সিরাত প্রতিটি ঘটনার মূল উৎস উল্লেখ করবে। সেইসাথে তুলে ধরবে এর প্রতিটি ফায়দা। বিশেষ ক্ষেত্রে আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রয়োজন অনুযায়ী এই সিরাহ বর্ণনার প্রামাণিকতা এবং প্রাথমিক উৎসগুলোর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ্য করবে।

তৃতীয়ত, নিজের ওপর একটি কঠোর শর্ত আরোপ করেছিলাম; আমি কখনো কোনো বিতর্কিত বা সহজেই ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে—এমন বিষয়ে পিছপা হব না।

প্রাথমিকভাবে সিরাতের শিক্ষার্থী হিসেবে আমার অধ্যয়ন শুরুর সময় কিছু বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতো। মনে হতো, এটি একেবারেই অসম্ভব। তখন মূলত সময়টির নৈতিক ও মৌলিক সমস্যাবলির সম্মুখীন হওয়ায় আমি একধরনের অসন্তোষ অনুভব করতাম। অতঃপর চিন্তা করে বের করার চেষ্টা করলাম, যথাযথ মসৃণ পন্থায়কীভাবে এই বিভ্রান্তিকর বিষয়ের মোকাবিলা করা যায়। বোঝার জন্য আমি কিছুটা সময় নিলাম। বোধ জাগ্রত হওয়ার পরে ইসলাম ও নবিজির প্রতি আমার ভালোবাসা অনেক গুণ বেড়ে গেল।

আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে দেখলাম, প্রায়শই ইসলামোফোবরা সিরাতের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে অশোভনীয় বর্ণনা তুলে আনে। আমি তখন লক্ষ্য স্থির করলাম, সত্যের বর্ণনাকে ইনিয়ে-বিনিয়ে ভিন্নভাবে তুলে ধরার কোনো প্রয়োজনই নেই। আমাদের সিরাতে এমন কিছুই নেই, যার জন্য আমরা লজ্জিত হতে পারি। আর এমন কিছু ঘটে থাকলে আমাদের দায়িত্ব হলো তা বোঝানো, ব্যাখ্যা করা এবং তার প্রেক্ষাপটটাকে যথাযথভাবে তুলে ধরা। যদি স্বাভাবিকভাবে এমন ঘটনা নাও ঘটে, তবুও আমাদের দায়িত্ব অন্তত এমন বর্ণনা আসার কারণটি তাদের বোঝানো। আমাদের যুবসমাজ যা কিছু জানতে চায়, তা আমার থেকে সঠিক প্রেক্ষাপটে শুনুক। ভুল প্রেক্ষাপটে কাটাছেঁড়া করে উপস্থাপিত তথ্য পাওয়ার চেয়ে এটাই বরং বহুগুণে ভালো। আমাদের ঐতিহ্য ও ইতিহাস সেন্সর করার কোনো কারণ নেই।

এই সময় বেশ কিছু বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়। সাধারণত আমি হজ, রমজান ও গ্রীষ্মকালে ব্যস্ত থাকি। যাহোক, ১০৪টি পর্বের পর শেষ পর্বটি অবশেষে ২০১৫ সালের মার্চ মাসে এমআইসি-তে সম্পন্ন হয়।

তারপর থেকে সিরিজটি অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে এবং অনেকেই এটি অন্যান্য ভাষায় সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। পৃথিবীর যেখানেই যাই না কেন, মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে বিনীত বোধ করি। তখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার এই সাধারণ প্রচেষ্টাটুকু গ্রহণ করেন। নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থে আমার নিজের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা আছে।

এই পৃথিবীতে আমি পঞ্চম দশকের ঘরে উপনীত হতে যাচ্ছি। আমার প্রথম প্রকাশিত বইয়ের প্রায় তিন দশক পরে ব্যক্তিগত ডায়েরিতে এই লেখাটি লিখছি। এরই মধ্যে আমি অর্জন করেছি একাধিক ডিগ্রি। এক ডজনেরও বেশি বই প্রকাশ করেছি, অর্ধ ডজনবার বাড়ি ও শহর পরিবর্তন করেছি, পরিবার শুরু করেছি এবং চার সন্তানকে বড়ো করেছি। নানাভাবেই সম্মানিত হয়েছি।

এরই মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। এই সময়ে আমার পরিবারই ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো সাহায্যকারী। এমন পিতা-মাতা দিয়ে আল্লাহ আমাকে রহম করেছেন, যার ফলে ক্রমাগত এগিয়ে গেছি সাফল্যের দিকে। আর আমার অনন্য সহায়িকা ছিল আমার ধৈর্যশীল জীবনসঙ্গী। আমার সন্তানেরা এখন আর ছোটো নেই, কিন্তু তারা প্রতিনিয়ত আমাকে আনন্দে ভরপুর

রাখে। তাদের দেখলে হৃদয়টা শীতল হয়ে যায়। এই কাজটি আমি তাদের প্রতি উৎসর্গ করছি।

আমি দুআ করি, আল্লাহ যেন আমার এই ছোট্ট প্রচেষ্টাটি গ্রহণ এবং এর ওসিলায় হাশরের ময়দানে নবিজির সুপারিশ লাভের সম্মান দান করেন।

হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞাত প্রজ্ঞার জন্য আপনি আমাদের নির্বাচন করেছেন তাদের মধ্যে, যারা এই জীবনে নবিজির সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেনি। হে রব! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমরা আমাদের হৃদয়-মন দিয়ে আপনার নবিকে ভালোবাসি। তাই আমরা আপনার কাছে দুআ ও আর্জি করছি, আপনি পরকালে তাঁর দিদার থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার হাবিব ও মুস্তফা মুহাম্মাদ (সা.)-এর সঙ্গে জান্নাতুল ফেরদাউসে বসবাসের সুযোগ দিন। আমিন!

ড. ইয়াসির ক্বাদি

অনুপম গুণাবলি

আমরা এখানে যার জীবন নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি, তিনি আর কেউ নন, অন্ধকার এই পৃথিবীতে আলোর দিশারি, জ্যোতির্ময় মহামানব মুহাম্মাদ (সা.)। তবে মহান এই পথপ্রদর্শকের জীবনী আলোচনা শুরু করার আগে আমরা জেনে নেব তাঁর অসাধারণ কিছু গুণাবলির কথা। এতে করে তাঁর জীবন সম্বন্ধে জানার ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ বেড়ে যাবে শতগুণে।

তবে সত্যি বলতে, কাজটা আসলে সহজ নয়। যে মহান সত্তাকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে বাছাই করেছেন, সেই মহামানবের জীবনী সাগর বা মহাসাগরের মতোই বিশাল। আমরা বড়োজোর সেই সাগরের এক আঁজলা জলই এই বইতে তুলে আনতে পারি; পুরো সাগরকে তুলে আনার দুঃসাহস করি কীভাবে? যেখানে আল্লাহ তায়ালা নিজে তাঁর রাসূল (সা.)-এর সুউচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন বারবার, সেখানে কোনো মানুষের পক্ষেই তাঁর হাবিবের মর্যাদা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরাটা কঠিন, ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব। আল্লাহ তায়ালা বলেন—'আমি সুউচ্চ করেছি তোমার খ্যাতি ও স্মরণকে।'[১] ইবনে আব্বাস (রা.)-সহ আরও অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছেন—'আল্লাহ তায়ালা নবিজির স্মরণকে এতটাই

[১] সূরা ইনশিরাহ : ৪

সমুন্নত করেছেন যে, যেখানে আল্লাহ তাঁর নিজের নাম উল্লেখ করেছেন, ঠিক সেখানেই তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর রাসূলের নামও।'

আরেক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলছেন, নবিজি সমগ্র মানবজাতির প্রতি দয়াস্বরূপ।[২] অর্থাৎ, নবিজিকে এই পৃথিবীতে পাঠানো অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অসাধারণ এক নিয়ামত। শুধু তিনি নিজে নন; বরং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত সবকিছুই দয়ায় পরিপূর্ণ। তিনি নিজে একটি রহমত, তাঁর রিসালাত একটি রহমত, তাঁর সমস্ত শিক্ষা রহমত, তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তা বিশ্বাস করা এবং তার ওপর আমল করাও একটি রহমত; সর্বোপরি রহমত তাঁর এই পৃথিবীতে আসাটাও। তাঁর প্রচারিত বার্তা সমগ্র মানবজাতির জন্যই বয়ে এনেছে অফুরন্ত দয়া ও কল্যাণের ফল্গুধারা।

প্রথমে আমরা নবিজির অনন্য কিছু নাম উল্লেখ করব, যার ভেতর লুকিয়ে আছে তাঁর পরিচয়। এই সুন্দর নামগুলো আমরা জানতে পেরেছি বিভিন্ন সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িদের মাধ্যমে। কোনো কোনো স্কলারের কাছে থেকে আমরা জানতে পারি, নবিজির সর্বমোট নামের সংখ্যা প্রায় ২৫০টি। তবে সব নাম নিয়ে না, আমরা এখানে আলোচনা করব নবিজির গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ কিছু নাম নিয়ে।

নবিজির এই বিভিন্ন নামের কথা পবিত্র কুরআন এবং হাদিস দুই জায়গাতেই বিভিন্ন বর্ণনায় উঠে এসেছে।

---

[২] সূরা আম্বিয়া : ১০৭

যেমন : জুবায়ের ইবনে মুতইম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন—'আমার বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি আল মাহি (যেই সত্তার মাধ্যমে আল্লাহর তায়ালা কুফরির অন্ধকার দূর করেছেন), আমি আল হাশির অর্থাৎ গোটা মানবজাতিকে কিয়ামতের ময়দানে আমার পরে পুনরুত্থিত করা হবে, আমি আল আকিব অর্থাৎ যার পরে আর কোনো নবি আসবে না।'[৩]

আরেক বর্ণনায় এসেছে—'আমি নাবিইয়ুর রহমাহ, নাবিইয়ুত তাওবা, আল মুকাফ্ফা, নাবিইয়ুল মালাহিম।'

আল কুরআনে 'মুহাম্মাদ' নামটি এসেছে মোট চারবার।[৪] 'আহমাদ' এসেছে দুই থেকে তিনবার। কুরআনে ঈসা (আ.)-এর উদ্ধৃতিতে বলা আছে—'আমার পরে এক নবি আসবেন, তাঁর নাম হবে আহমাদ।'[৫]

মুহাম্মাদ ও আহমাদ দুটি নামই এসেছে আরবি মূল শব্দ 'হামিদা' থেকে। অর্থ—প্রশংসা বা তারিফ। তবে এই প্রশংসা কোনো সাধারণ প্রশংসা নয়। ধরুন, কেউ আপনার কোনো উপকার করল। আর আপনি তার প্রশংসা করলেন, তাহলে কি এটাকে হামদ বলা যাবে? না, যাবে না। বরং হামদ মানে বোঝায় প্রশংসার সর্বোচ্চ পর্যায়; যে পর্যায়ে দুনিয়ার মানুষজন তো

---

[৩] সহিহ মুসলিম

[৪] দেখুন, সূরা আলে ইমরান : ১৪৪; সূরা আজহাব : ৪০; সূরা মুহাম্মাদ : ২; সূরা ফাতহ : ২৯

[৫] সূরা সফ : ৬

বটেই, ফেরেশতারা এমনকি মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনও তাঁর প্রশংসায় মুখর হন। আর নবিজির স্বভাবজাত গুণগুলোই মূলত তাঁকে এই প্রশংসার যোগ্য করে তুলেছিল আমাদের সবার কাছে। শুধু আমরা মুসলিমরাই না; বরং অনেক অমুসলিমও তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়।[৬] নবিজির আগে কিংবা পরে আর কেউ এই পৃথিবীতে এত বেশি প্রশংসার অধিকারী হতে পারেননি। আহমাদ নামের এরচেয়ে বড়ো সার্থকতা আর কী হতে পারে?

একটি দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—বিচার দিবসে যতক্ষণে সবাই জানবে ইসলামই একমাত্র সত্য জীবনব্যবস্থা, ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তখন আর থাকবে না কোনো ধরনের ভুল শোধরানোর সুযোগও। লোকজন দৌড়ে আদম (আ.)-এর কাছে মিনতির স্বরে বলবে—'আপনি তো আমাদের আদি পিতা। আল্লাহ আপনার মাঝে (সৃষ্ট) প্রাণ ফুঁকে দিয়েছেন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আপনার সন্তানেরা কী কঠিন অবস্থায় আছে? আল্লাহর কাছে একটু সুপারিশ করুন, যাতে তিনি বিচার কাজ শুরু করেন। আর আল্লাহ যেন আমাদের মাফ করে দেন।'

কিন্তু তিনি ব্যথাতুর হৃদয়ে বলবেন—'ইয়া নফসি। আমি এমন এক ভুল করেছি, যেটা করা উচিত ছিল না। সেই বিষয়টি নিয়ে আজ আমি নিজেই খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। জানি না আল্লাহ

---

[৬] সূরা আহজাব : ৫৬

আমার কী ফয়সালা করবেন।' এরপর তিনি সুপারিশের জন্য অন্য কারও কাছে যেতে বলবেন।

অতঃপর লোকেরা ছুটে যাবে নুহ (আ.)-এর কাছে। তাঁকেও করা হবে এই একই অনুরোধ। কিন্তু তিনি বিষণ্ন মুখে বলবেন—'মহাপ্লাবনের দিন আল্লাহ তায়ালা কাউকে বাঁচানোর জন্য দুআ করতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি সে কথা শুনিনি। আমি আমার ছেলের জন্য দুআ করেছিলাম। এর মাধ্যমে আমি আল্লাহর অবাধ্য হয়েছি। এখন নিজেকে নিয়ে বড্ড পেরেশানিতে আছি। সুতরাং তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা বরং অন্য কারও কাছে যাও।'

লোকজন তখন ছুটে যাবে ইবরাহিম (আ.)-এর কাছে। কিন্তু তিনিও অপরাগতা প্রকাশ করে বলবেন—'আমি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছি।' আর তিনিও তাঁর বলা সেই মিথ্যা তিনটি নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবেন। ফলে লোকজনকে তাঁর পক্ষেও কোনো সাহায্য করা সম্ভব হবে না। যদিও ইবরাহিম (আ)-এর বলা কথাগুলো সেই অর্থে মিথ্যা ছিল না; বরং বলা চলে তিনি কিছুটা কৌশল করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছিলেন। যেমন : তাঁর বলা প্রথম মিথ্যাটা ছিল মূর্তি ভাঙাসংক্রান্ত ব্যাপারে। ছোটোবেলায় সবগুলো মূর্তি নিজের হাতে ভাঙার পর তিনি সবচেয়ে বড়ো মূর্তির হাতে হাতুড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। আর মানুষের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এসব বড়ো মূর্তির কাজ। সত্যিকার অর্থে দেখতে গেলে, এটা কোনো মিথ্যা ছিল না; বরং এটা ছিল মানুষকে মূর্তিপূজার অসারতা বোঝানোর একটা কৌশলমাত্র।

আরেকটি উত্তর ছিল অসুস্থতার ব্যাপারে। এটি ছিল মূর্তি ভাঙার কিছুক্ষণ পূর্বের ঘটনা। সেদিন লোকজন উৎসবের জন্য শহরের বাইরে যাচ্ছিল। তারা তাঁকেও সঙ্গে নিতে চাইলে তিনি বললেন—'না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না।' তখন অসুস্থতার কথা বলে তিনি থেকে যান, যাতে মূর্তিগুলো ভাঙতে পারেন।

তৃতীয় উত্তরটি ছিল, নিজের স্ত্রীকে বোন বলার ব্যাপারে। রাজার কাছ থেকে স্ত্রীকে বাঁচাতে মূলত ইবরাহিম (আ.) এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই কথাটিও মিথ্যার মধ্যে পড়ে না। কারণ, এক অর্থে আমরা প্রত্যেকে তো একই বাবা-মা অর্থাৎ আদম-হাওয়ার সন্তান। সে সূত্রে আমরা সবাই ভাই-বোন।

এই কৌশলী উত্তরগুলো নিয়েও ইবরাহিম (আ.) খুব পেরেশানির মধ্যে সময় কাটাবেন।

তারপর মানুষ ছুটে যাবে মুসা (আ.)-এর কাছে। তিনিও সুপারিশ থেকে পিছিয়ে যাবেন। বলবেন—'রাগের বশে আমি এক লোককে মেরে ফেলেছিলাম। ফলে আল্লাহ আজ আমার জন্য কী ব্যবস্থা রেখেছেন, সেটা জানতেই আমি বেশি উদ্‌গ্রীব।' যদিও এই ঘটনা ছিল নিছক একটি দুর্ঘটনা।

ঈসা (আ.) বলবেন—'তিনিও এই সুপারিশের যোগ্য নন। কারণ, তাঁর অনুসারীরা ত্রিতত্ত্বসহ বিভিন্ন বিকৃত চর্চার অনুসরণ করেছে।'

সবশেষে সকলেই হন্যে হয়ে ছুটে আসবে প্রিয় নবিজির কাছে। তারা নবিজিকে অনুরোধ করবে—তিনি যেন গোটা মানবজাতির

প্রতিনিধি হয়ে আল্লাহর কাছে বিচারকাজ শুরু করার অনুরোধ করেন। সেই দিনটি এত বেশি কঠিন হবে, যা অনুমান করা আমাদের জন্য অসম্ভব। ভয়, দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক মিলিয়ে সময়টা হয়ে উঠবে সবার কাছে অসহনীয়। নবিজির কাছে তাঁরা করজোড়ে অনুনয়বিনয় করবে। দয়ার নবি তাদের ফিরিয়ে দেবেন না; বরং বলবেন—'এটা আমার কাজ।'[৭] তখন গোটা মানবজাতি সমস্বরে মেতে উঠবে তাঁর প্রশংসায় আরও একবার। তাঁকে দেওয়া হবে 'মাকামে মাহমুদ' অভিধা—'সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থান'।[৮]

'আহমাদ' মানে 'সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রশংসা'। আর 'মুহাম্মাদ' মানে 'সর্বোচ্চ পরিমাণে প্রশংসা'। দুটি শব্দের অর্থ একসাথে দাঁড়ায়—সর্বোচ্চ ও অবিরাম প্রশংসা।

নবি মুসার অনুসারীদের দেওয়া হয়েছিল 'মুহাম্মাদ' অভিধা। কারণ, আমাদের পর বনি ইসরাইলিরাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। সংখ্যায় যেহেতু বেশি, ফলে 'মুহাম্মাদ' তাদের জন্য জুতসই। অন্যদিক আহমাদ অভিধা দেওয়া হয়েছিল ঈসা নবির অনুসারীদের। সংখ্যায় কম হলেও তারা ছিলেন নিখাদ বিশ্বাসী। আর তাদের ঈমানের জোরও ছিল অনেক বেশি। তাদের ওপর চালানো হয়েছিল অত্যন্ত বর্বর নির্যাতন। রোমানরা তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। লোহার চিরুনি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত

---

[৭] সহিহ বুখারি : ৪৭১২ ও ৭৫১০

[৮] সূরা বনি ইসরাইল : ৭৯

করেছে শরীরের চামড়া; কিন্তু ঈমান থেকে একচুলও সরাতে পারেনি। এজন্য তাদের ভূষিত করা হয়েছিল 'আহমাদ' অভিধায়।

নবিজির তৃতীয় নাম—আল মাহি। এই নামের অর্থ হলো—মুছে ফেলা; যিনি কুফরি মুছে দেন। নবিজি বলেছেন, আল্লাহ তাঁকে দিয়ে কুফরি ও শিরককে দূর করে দেবেন।[৯] ওই সময়ে সমগ্র আরব ডুবে ছিল কুফরি ও শিরককে। কিন্তু মাত্র ২০/৩০ বছরের মধ্যে মুসলিমরা হয়ে ওঠেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর ৬০/৭০ বছরের মাথায় ইসলাম পৌঁছে যায় সুদূর চীন-স্পেনে।

নবিজির অন্য নামগুলোর মধ্যে আছে—

আল হাশির[১০] : তাঁর আসার পরই কিয়ামত আসবে। বিচার দিন যে অতি নিকটে, নবিজির আগমন সেটার প্রথম ইঙ্গিত। এই নামের আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে, তাঁকেই প্রথম বিচার দিনে ওঠানো হবে, এরপর বাকিদের। আমরা জানি, সবার আগে বিচার দিনে উঠবেন নবিগণ, তাঁদের পর সালিহ তথা ন্যায়পরায়ণগণ, তাঁদের পর শহিদগণ। তারপর বাকি সবাই।

আল আকিব[১১] : উত্তরসূরি, যিনি সবার শেষে আসেন। এর অর্থ তিনি শেষ নবি।

নাবিউর রাহমাহ[১২] : দয়ার নবি।

---

[৯] সহিহ বুখারি : ৪৮৯৬

[১০] সহিহ বুখারি : ৪৮৯৬

[১১] সহিহ মুসলিম : ২৩৫৪

[১২] সহিহ মুসলিম : ৪২৫২

নাবিউত তাওবা[১৩] : অনুতাপের নবি। অর্থাৎ তাঁকে বিশ্বাস করলে, তাঁর অনুসরণ করলে লোকজন আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে ক্ষমা লাভ করবে।

আল মুকাফ্ফা : যেই নবি সর্বশেষে এসে পূর্ববর্তী সকল নবির রিসালাতকে পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন। যার রিসালাতের মাধ্যমে পূর্ববতী সকল নবির রিসালাতের ধারার অবসান ঘটেছে।

নাবিউল মুলাহিম[১৪] : পরীক্ষার নবি। তাঁর উম্মতই মুখোমুখি হবে সবচেয়ে কঠিন সব পরীক্ষার। যেমন : দাজ্জাল, ভয়ানক তিন ভূমিকম্প, মাহদি ও ঈসা (আ.)-এর পুনরায় আগমন।

তাঁকে এমন কিছু খাসাইস তথা বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে, যা আর কাউকে দেওয়া হয়নি; অন্য কোনো নবিকেও না। তাঁর অনন্য কিছু গুণাবলি আছে। কোনো কোনো আলিম তাঁর প্রায় ৫০টি অনন্য গুণাবলি ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—

- তিনিই সর্বশেষ নবি।[১৫]
- তাঁর নবুয়ত নির্দেশিত হয়েছিল আদম (আ.)-এর সৃষ্টিরও আগে; তখনও মাটি দিয়ে তৈরি আদমের মাঝে প্রাণ ফুঁকে দেওয়া হয়নি।

---

[১৩] সহিহ মুসলিম : ৪২৫২

[১৪] সহিহ মুসলিম : ৪২৫২

[১৫] সূরা আহজাব : ৪০

একবার এক সাহাবি নবিজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'আল্লাহ কখন আপনাকে নবুয়ত দিয়েছিলেন? নবিজি বলেছিলেন, আদম (আ.) যখন মাটি ও রুহের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলেন।'

- নবিজিকে শুধু পৃথিবীর মানুষের জন্যই পাঠানো হয়নি; বরং পাঠানো হয়েছে জিনদের জন্যও।[১৬]

  কেউ বলতে পারেন, আদম ও নুহ (আ.)-কেও তো সব মানুষের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মূলত নির্দিষ্ট করে সব মানুষের জন্য পাঠানো হয়নি। কারণ, আদম (আ.)-এর সময় ছিল কেবল তাঁর সন্তানসন্ততিরা। অন্যদিকে মহাপ্লাবনের পর পৃথিবীতে বেঁচে ছিল কেবল নুহ (আ.)-এর সাথে বিশাল নৌকায় চড়া বিশ্বাসীরা। কিন্তু নবিজি শুরু থেকেই পৃথিবীর সব জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরণ হয়েছেন।

- দুশমনদের মনে নবিজির ভয়। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন—'আমি আমার শত্রুদের থেকে এক মাসের দূরত্বে থাকাবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দেন।' এই বৈশিষ্ট্য ছিল শুধু তাঁর জন্য। নবিজি ময়দানে পৌঁছলেই শত্রুর শিরদাঁড়া দিয়ে বয়ে যেত ভয়ের শীতল স্রোত। কাঁপুনি ধরে যেত শত্রুদের অন্তরে। অজানা আতঙ্কে তাদের মুখ হয়ে যেত পাংশু; যেন যমদূত তাদের সামনে ঘোরাফেরা করছে।[১৭]

---

[১৬] *মাজমুউল ফাতওয়া* : ১১/৩০৩, ৪/২০৪

[১৭] *সহিহ আল জামে* : ১৭২৮

● তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। নবিজি একবার এক বিশাল অনুসারী গোষ্ঠী দেখলেন। চোখ যতদূর যায়, ততদূর তাদের বিস্তৃতি। তিনি ভাবলেন, এটা বোধ হয় তাঁর উম্মাহ। কিন্তু না। জানা গেল, এটা মুসা নবি (আ.)-এর উম্মাহ। এরপর তিনি আরেক দল বিশাল অনুসারী গোষ্ঠী দেখলেন। তাদের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল চোখের দৃষ্টিসীমা। নবিজিকে বলা হলো, এটা আপনার উম্মাহ।

একদিন তিনি সাহাবিদের বললেন—'জান্নাতের অর্ধেক লোকই যদি তোমাদের লোকজন হয়, তোমরা কী পরিমাণ খুশি হবে বলো তো?'

সাহাবিরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলেন—'আল্লাহু আকবার!'

নবিজি বললেন—'আমার আশা, জান্নাতের তিন ভাগের দুই ভাগ লোক হবে আমার উম্মত থেকে।'[১৮]

সুবহানআল্লাহ! বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিমের সংখ্যা আনুমানিক ২০০ কোটি। আগে যারা এসেছেন, তাদের সংখ্যা কত? বনি ইসরাইল ও ঈসা নবির অনুসারীদের মিলিয়ে কত হবে সংখ্যাটি? নবিজি যখন এই আশা প্রকাশ করেছেন, তখন সর্বসাকুল্যে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল বড়োজোর দেড়-দুই হাজার। আর খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ২০/৩০ লাখ। হাজার হাজার ইহুদি। এ রকম একটি সময়ে তিনি এমন এক ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। আজ খেয়াল করে দেখেন, কত অজস্র মুসলিম চারদিকে। এটাও কি এক মহা অলৌকিক ব্যাপার নয়?

---

[১৮] সহিহ বুখারি : ৩৩৪৮; সহিহ মুসলিম : ২২২

- কুরআন নামক সবচেয়ে শক্তিশালী অলৌকিক জিনিস দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এর সমকক্ষ অলৌকিক কিছু অন্য কোনো নবি-রাসূলকে দেওয়া হয়নি। অন্য অলৌকিক ঘটনাগুলো তো সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। যেমন বলা যায়—লোহিত সাগর ভাগ হওয়ার ঘটনা কিংবা ঈসা (আ.) কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা ইত্যাদি। কিন্তু কুরআনের কোনো শেষ নেই; বরং এর অলৌকিকত্ব চিরঞ্জীব। এমনকি আজও, এখনও গ্রন্থটি আমরা পাঠ করতে পারি। জীবন্ত মুজিজার কী অসাধারণ এক উদাহরণ!

- রাত্রি সফর ও দ্যুলোকে আরোহণ—ইসরা ও মিরাজ।[১৯] জীবিত অবস্থায় কোনো নবি এমন সফর করেননি। মুসা (আ.) দুনিয়াতে (সিনাই পর্বতে) থেকেই আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ কথা বলার জন্য নবিজিকে এমন জায়গায় ডেকে নেন, যেখানে ফেরেশতা জিবরাইল (আ.)-এর প্রবেশাধিকার পর্যন্ত ছিল না। একটা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে জিবরাইল (আ.) বলেছিলেন—'এখানেই আমার সীমা শেষ। এর বেশি আমি আর যেতে পারব না।' চিন্তা করুন, আল্লাহ তায়ালা কী বিশাল মর্যাদা তাঁকে দিয়েছিলেন!

- নবিজি বলেছেন—'আমি আদমসন্তানের সাইয়্যিদ।' তিনি নেতা হওয়ার যোগ্য দাবিদার। বিচার দিনে তিনিই হবেন সবার নেতা।

---

[১৯] সূরা বনি ইসরাইল : ১

- কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁকেই ওঠানো হবে।[২০] এটাই তাঁর 'হাশির' নামের তাৎপর্য। সর্বপ্রথম তাঁরই গায়ে পরানো হবে পোশাক।

- তাঁকে দেওয়া হবে সবচেয়ে বড়ো সুপেয় পানির প্রবাহিত ধারা—'হাউজে কাউসার'।[২১] বর্গাকৃতির এই জলাধারের আকার হবে মক্কা থেকে ইয়েমেনের সানা পর্যন্ত, অর্থাৎ গোটা আরব উপদ্বীপের সমান।

- কাউসার জান্নাতের মূল নদী। বাকি সব নদী এই নদী থেকেই প্রসূত। বাকি জান্নাতিরা নবিজির উপহার পাওয়া নদী থেকে পান করবে।

- তিনিই প্রথম পুলসিরাত পার হয়ে উম্মতকে নিয়ে সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। জান্নাতের দরজায় তিনিই প্রথম কড়া নাড়বেন। তাঁর নামেই খুলবে জান্নাতের দরজা। প্রহরী ফেরেশতা জিজ্ঞেস করবেন—'কে?' বলা হবে, মুহাম্মাদ। ফেরেশতা বলবেন—'আমাকে আপনার নামে দরজা খোলার হুকুম দেওয়া হয়েছে।'[২২]

  অর্থাৎ তাঁর নাম হলো জান্নাতের দরজা খোলার চাবি। জান্নাতে সবার আগে প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর ডান পায়ের ছাপ পড়বে। এরপর যাবে তাঁর উম্মত; যদিও ধারাক্রম অনুযায়ী আমরা পৃথিবীতে এসেছি সবার পরে।

---

[২০] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৪৯৬

[২১] সূরা কাউসার : ১

[২২] সহিহ মুসলিম : ১৯৭

● জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান ফেরদাউসে আলার অধিকারী হবেন আমাদের প্রিয়নবি। কোনো কোনো আলিম বলেন—জান্নাতের যত উঁচুতে যাওয়া হবে, লোকজনের সংখ্যা ততই কমতে থাকবে। একটা সময় এমন একটি সমতল ভূমি আসবে, যেটা বরাদ্দ থাকবে শুধু একজনের জন্য। সবচেয়ে সুন্দর এই জান্নাত হবে আল্লাহ তায়ালার মহা সিংহাসন বরাবর নিচে। জায়গাটার নাম ফাদিলা। নবিজি বলেছেন—'ফাদিলা জান্নাতের এমন এক জায়গা, যেটা আল্লাহ শুধু তাঁর একজন বান্দার জন্য বাছাই করেছেন।' এরপর তিনি বিনয়ের সুরে বলেন—'আশা করি, আমি হব সেজন।'[২৩] তিনি ছাড়া এই মহাসম্মানিত স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া তিনি আমাদের বলেছেন, আমরা যেন আল্লাহর কাছে দুআ করি, যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আল ওয়াসিলা ও ফাদিলা দান করেন। এজন্যই প্রতিবার আজানের পর আমরা দুআয় বলি—

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا

الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

'হে আল্লাহ! এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া সালাতে তুমিই প্রভু। তুমি মুহাম্মাদ (সা.)-কে দান করো আল ওয়াসিলা ও আল ফাদিলা। আর তাঁকে অধিষ্ঠিত করো জান্নাতের সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ।'

---

[২৩] *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ১৬৯২

আসলে নবিজিই হবেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। কারণ, তিনি ছাড়া আর কেউ সেই জায়গার যোগ্য নন। আজকে যারা আমাদের প্রিয় নবিজিকে নিয়ে হাসি-তামাশা করে, রঙ্গ-মশকরা করে, তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকে, বিচার দিনে তারাও তাঁর প্রশংসা করবে।

তাঁকে দেওয়া হবে সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা।